কবিতার জগৎ

নবম সংকলন ॥ মে ২০১২

কবিতার জগৎ নবম সংকলন ॥ মে ২০১২

অবিশ্বাসের দর্শন : যৌক্তিকভাবে মনকে জাগানোর ঐকান্তিক প্রয়াস

শফিউল জয়

অবিশ্বাসের দর্শন বইটির লেখক দুইজন। প্রথম-জন, অভিজিৎ রায় ইতোমধ্যেই তার ব্যতিক্রমী কিছু বইয়ের মাধ্যমে পাঠকদের মাঝে স্থান করে নিয়েছেন। তিনি মূলত দর্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের নানা বিষয়-আশয় নিয়ে লেখেন। তাঁর *আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী* (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫) এবং *মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে* (অবসর, ২০০৭) বই দুটো ইতোমধ্যেই পাঠকপ্রিয় হয়েছে। পাশাপাশি তিনি প্রথাবিরোধী, অবগুণ্ঠিত এবং ট্যাবু-ভাঙা বিষয়াদি নিয়েও লেখেন। তাঁর *সমকামিতা : বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান* (শুদ্ধস্বর, ২০১০) বইটির আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল *বইয়ের জগৎ*-এরই একটি সংখ্যায়। *অবিশ্বাসের দর্শন* বইটির আরেকজন লেখক রায়হান আবীর। তিনিও বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে লিখে থাকেন। এই লেখকদ্বয়ের মধ্যে লেখালেখির ক্ষেত্রে যে মিলটি রয়েছে তা হচ্ছে তাঁরা দুজনই ব্লগে লেখেন। বলা যেতে পারে দুজনই ব্লগাঙ্গনে খুবই তৎপর। এই বইয়ের অনেক লেখাই প্রথমে *ক্যাডেট কলেজ ব্লগ* ও *মুক্তমনা*তে ছাপা হয়েছে, এবং সেখানে বিভিন্ন ব্লগারদের সুচিন্তিত মতামত বইয়ের মানোন্নয়নে সহায়তা করেছে – এমন মত লেখকদের। ব্লগের এটা হয়তো একটা বড় সুবিধা যে, সরাসরি পাঠকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা যায় এবং বিভিন্ন বিতর্কের মাধ্যমে অনেক কিছু পরিষ্কার করে বোঝানো যায়। ব্লগের বিভিন্ন লেখা নিয়ে পরবর্তী সময়ে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অভিজিৎ রায় আর রায়হান আবীরের *অবিশ্বাসের দর্শন* বোধ করি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, বাঙলা ব্লগ জগতে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার যে অধ্যায় সূচিত হয়েছে তার একটা তুলনামূলক নির্যাস বইটিতে মোটামুটি সংক্ষেপে কিন্তু খুবই সাবলীলভাবে পাওয়া যাবে।

রিচার্ড ডকিন্স, ভিক্টর স্টেঙ্গার, স্যাম হ্যারিস, ক্রিস্টফর হিচেন্সরা পশ্চিমে সমাজ থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্যে New atheism নামের যে দর্শনের সূত্রপাত করেন, তার দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা হয়েছে বইয়ের প্রবন্ধগুলো। বিজ্ঞানের অনেক জটিল ব্যাপার, যেগুলো নিয়ে ধার্মিকেরা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেন, সেগুলোর উপযুক্ত জবাব এই বইটিতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হুমায়ুন আজাদের *আমার অবিশ্বাস*-গ্রন্থটির সাথে অনেক পাঠকই হয়তো পরিচিত। হুমায়ুন আজাদের আলোচিত গ্রন্থ *আমার অবিশ্বাস*-এর সমষ্টিগত বাণীটি হচ্ছে প্রজ্ঞাময়; আর *অবিশ্বাসের দর্শন* সম্পূর্ণভাবেই যুক্তিনির্ভর। *আমার অবিশ্বাস* বইয়ের ভাষায় যে কাব্যিক আবেদন আছে, তা পাওয়া যাবে না হয়তো *অবিশ্বাসের দর্শন*-এ; কিন্তু এতে প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অকাট্য যুক্তি দিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে আমাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস কতটা নাজুক! শত শত বছর ধরে যে বিশ্বাস আমরা লালন করে আসছি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নির্মোহ বিচার করাটাই একবিংশ শতাব্দীর New atheism আন্দোলনের লক্ষ্য। পশ্চিমের বইয়ের জগতে যেমন স্টেঙ্গারের *God: the failed hypothesis,* ডকিন্সের *The God Delusion,* স্যাম হ্যারিসের *The End of Faith*, এই বইটিও তার প্রাঞ্জলতা, বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোর সাবলীল উপস্থাপনা এবং অকাট্য বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তির খাতিরে বাঙলা বইয়ের জগতে তদ্রুপ। বহু বিষয়ে আলোকপাত করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয় নি, তবে দর্শনগত সামগ্রিকতার বিচারে সেই অভিযোগটা অনেকাংশেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। বইটা পড়ে মনে হয়েছে, লেখকদ্বয়ের মূল লক্ষ্য ছিল এই মুক্তচিন্তা আন্দোলনের সার্বিক একটা উপস্থাপন, যা তারা বিচক্ষণতার সঙ্গেই করতে পেরেছেন।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসু মনোভাবকে কেন্দ্র করে। যেমন, বিজ্ঞান কি অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে অভিমত দিতে অক্ষম, বিজ্ঞান কি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, এমন বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘর্ষসহ নানা প্রশ্ন এখানে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলে, ঈশ্বর অনুকল্পে বিজ্ঞানের সীমারেখা টানার ব্যাপারটার যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। খুব বলিষ্ঠভাবেই এখানে বলা হয়েছে,

> ... বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রের নানা দিকে বিবর্তন ঘটেছে। ঈশ্বর সংজ্ঞায়িত নন, ঈশ্বর বিজ্ঞানের বিষয় নন, কিংবা ঈশ্বরকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটাই করা যায় না – এমন বক্তব্যগুলোকে এখন আর ঢালাওভাবে পতাকার মতো বহন করা হয় না। জুডিও-খ্রিস্টান-ইসলামিক ঈশ্বরের অনেক বৈশিষ্ট্য যে সুসংজ্ঞায়িত তা ধর্মগ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। যেমন, সেই ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ঈশ্বর – তিনি রাগ ক্ষোভ ঘৃণা প্রকাশ করেন, অবিশ্বাসীদের শাস্তি

দেন, তার জন্য আরশ বা সিংহাসন রয়েছে, ইত্যাদি। এখন এ ধরনের ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব তৈরি করে থাকেন, জীবন তৈরির পরিকল্পনা এবং নকশা প্রণয়ন করে থাকেন, প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে থাকেন তবে কিন্তু সে-সব দাবিগুলো আমাদের পরীক্ষা করে যাচাই করতে পারার কথা। আমরা আজ জানি, যাচাইয়ের পর বেশ অনেক দাবিই ইতিমধ্যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরাই তা করেছেন। বিবর্তন তত্ত্বই প্রমাণ করেছে জেমস আশারের ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির কেচ্ছাকাহিনী কিংবা ২৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নূহের প্লাবনের কেচ্ছা মিথ্যা। এ ধরনের অনেক কিছুই ভবিষ্যতে যে বিজ্ঞান ভুল প্রমাণ করবে না তা কে বলতে পারে? যেমন, নব্যনাস্তিকতাবাদী বিজ্ঞানীরা মনেই করেন, যীশুর ভার্জিন বার্থ, যীশুর পুনরুত্থান, আত্মার অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর পরে তার বেঁচে থাকা – ধার্মিকদের কাছ থেকে আসা এই দাবিগুলো আসলে প্রকারান্তরে বৈজ্ঞানিক দাবিই; বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা যাবে। রিচার্ড ডকিন্স তার শীর্ষ বিক্রিত বই *গড ডিলুশন*-এ পরিষ্কার করেই বলেন, 'বিনা পিতায় যীশু জন্মাতে পারেন কিনা তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অংশ, কোনো নৈতিকতা বা মূল্যবোধের প্রশ্ন নয়।' (অবিশ্বাসের দর্শন, পৃষ্ঠা ২০-২১)

এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ্য যে, মাঝে-মধ্যেই আমরা দেখি প্রার্থনা করার সঙ্গে রোগমুক্তির সম্পর্ক নিয়ে নানাভাবে জল ঘোলা করা হয় গণমাধ্যম এবং মিডিয়াগুলোতে। যেমন, কিছুদিন আগে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ প্রথম আলোতে প্রকাশিত তাঁর একটা লেখায় বলেছিলেন, প্রার্থনার সঙ্গে নাকি রাগমুক্তির একটা সম্পর্ক আছে (যদিও তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ তিনি হাজির করেন নি); কিন্তু *অবিশ্বাসের দর্শন* বইয়ের এই অধ্যায়টাতে রেফারেন্সসহ তুলে ধরা হয়েছে যে প্রার্থনা কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না রোগমুক্তির ক্ষেত্রে। প্রখ্যাত মায়ো ক্লিনিক কিংবা ডিউক ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো প্রার্থনার সঙ্গে রোগীর ভালো হওয়ার কোনো সম্পর্কই খুঁজে পায় নি বলে জানিয়েছেন লেখকেরা [পৃষ্ঠা ২১]।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর আরেকটি লেখায় মঙ্গলগ্রহে ক্যামেরা পাওয়ার উদাহরণ টেনে ঈশ্বরের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে একটা অবৈজ্ঞানিক লেখা লিখেছিলেন,

> ...যদি মঙ্গল গ্রহে হাঁটতে হাঁটতে একটা ডিজিটাল নাইকন ক্যামেরা পেয়ে যান, তাহলে তাঁকে বলতেই হবে এই ক্যামেরা আপনা-আপনি হয় নি। এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। [হুমায়ূন আহমেদ, মহেশের মহাযাত্রা, *কালের কণ্ঠ*, ১৭ জুন ২০১১]

এই ডিজাইন আর্গুমেন্টের বিপক্ষ যুক্তি অনেক আগেই *অবিশ্বাসের দর্শন* বইতে দেয়া আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। লেখকেরা জানিয়েছেন, উইলিয়াম প্যালে ১৮০২ সালে প্রকাশ করেন 'Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature' নামের বইটি। ধর্ম ও দর্শনের এই বিখ্যাত বইয়ে প্যালে রাস্তার ধারে একটি ঘড়ি এবং পাথর পড়ে থাকার উদাহরণ হাজির করেছিলেন এভাবে :

> ... ধরা যাক ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ আমার পা একটা পাথরে লেগে গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এই পাথরটা কোত্থেকে এলো? আমার মনে উত্তর আসবে – প্রকৃতির অন্য অনেক কিছুর মতো পাথরটাও হয়ত সবসময়ই এখানে ছিল। ...কিন্তু ধরা যাক আমি পথ চলতে গিয়ে একটা ঘড়ি কুড়িয়ে পেলাম। এবার কিন্তু আমার কখনই মনে হবে না যে ঘড়িটিও সব সময়ই এখানে পড়ে ছিল।

নিঃসন্দেহে ঘড়ির (কিংবা ধরা যাক হুমায়ূন আহমেদের ক্যামেরার কথাই) গঠন পাথরের মতো সরল নয়। একটি ঘড়ি দেখলে বোঝা যায় – ঘড়ির ভিতরের বিভিন্ন ছোট ছোট অংশগুলো কোনো এক কারিগর এমনভাবে তৈরি করেছেন যেন সেগুলো সঠিকভাবে সমন্বিত হয়ে কাঁটাগুলোকে ডায়ালের চারপাশে মাপমতো ঘুরিয়ে ঠিকঠাক মতো সময়ের হিসেব রাখতে পারে। কাজেই পথে ঘড়ি কুড়িয়ে পেলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য যে ওখানে আপনাআপনি ঘড়ির জন্ম হয়নি বরং এর পেছনে একজন কারিগর রয়েছেন যিনি অতি যত্ন করে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘড়িটি তৈরি করেছেন। ধর্মবেত্তা উইলিয়াম প্যালে যেখানে ঘড়ির কথা বলেছিলেন, হুমায়ূন আহমেদ একই ধরনের যুক্তির অবতারণা করেছেন মঙ্গল গ্রহে 'হাঁটতে হাঁটতে' একটা ডিজিটাল 'নাইকন ক্যামেরা' পাওয়ার কথা উল্লেখ করে। বলাবাহুল্য, এই জনপ্রিয় ভাববাদী যুক্তিগুলো খণ্ডিত হয়েছে অন্তত কয়েক দশক আগেই। বস্তুত ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব আসার পর প্যালের ডিজাইন-তত্ত্বের অপমৃত্যুই ঘটেছে বলা যায়। যেমন, জীবজগতে চোখ বা এ ধরনের জটিল প্রত্যঙ্গের উদ্ভব ও বিবর্তনের পেছনে ডারউইন প্রস্তাব করেছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন নামক বস্তুবাদী প্রক্রিয়ার, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা

পরিবর্তনের ফলে চোখের মতো অত্যন্ত জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে ওঠা সম্ভব। একাধিক ধাপে ঘটা এ প্রক্রিয়াটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (Cumulative selection)। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধাপে ধাপে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বইয়ের লেখকেরা অজস্র রেফারেন্সের মাধ্যমে বিষয়টি পাঠকদের জন্য পরিষ্কার করেছেন। ডারউইনের অনেক আগে জন্মানো প্যালেকে না হয় ক্ষমা করা যায় বিবর্তন তত্ত্ব না জানা থাকার অজুহাতে – ১৮০২ সালের একটি লেখায় ঝোপঝাড়ে পড়ে থাকা ঘড়ির মধ্যে ঈশ্বর আবিষ্কার করতে, কিন্তু এর দুশ বছর পরে যখন বিবর্তন একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার, যখন স্টিফেন হকিং-এর মতো পদার্থবিদেরা ঈশ্বরের অনুকল্প ছাড়াই মহাবিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারছেন (এ প্রসঙ্গে স্টিফেন হকিং এবং লিওনার্ড ম্লোডিনোর লেখা The Grand Design বইটি পড়া যেতে পারে[১]), সেই সময়ের বাসিন্দা হয়েও হুমায়ূন আহমেদ এখনো মঙ্গল গ্রহে ক্যামেরার দোহাই দিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এটি দেখেই বরং অবাক হতে হয়; রবিঠাকুরের ভাষায় – 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'!

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও যে চমৎকার লেখাগুলো আছে, তার মধ্যে 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ব্যাড ডিজাইন' এবং 'আদম-হাওয়া ও নূহের মহাপ্লাবন' লেখা দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ব্যাড ডিজাইন' লেখাটা শুরু হয়েছে রবিন উইলিয়ামের একটা মুভির উক্তি থেকে –

> 'একজন ইনটেলিজেন্ট ডিজাইনার কি তার ডিজাইনে কখনো বিনোদন স্থানের পাশে পয়ঃনিষ্কাশন পাম্প রাখবেন?' (পৃষ্ঠা ৬৭)।

প্রশ্নটা খুবই মজার এবং আমাদের মানবদেহের ডিজাইন-যে কোনো বিধাতার আদর্শ ডিজাইন না; এর সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি নিয়ে কেবল বিবর্তনীয় বিভিন্ন ধাপেই যে আমরা এই কাঠামোতে এসে পৌঁছেছি – এই লেখাটা পড়লে মোটামুটি শক্ত ধারণা এসে যায়। আর 'আদম-হাওয়া ও নূহের মহাপ্লাবন' পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একজোড়া মানুষ থেকে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ ছড়িয়ে পড়ার গালগল্প কতটা অসার এবং অসম্ভব। নূহের মহাপ্লাবনের কাহিনিটা এসেছে হিব্রু উপাখ্যান থেকে এবং এর কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। প্রধান তিনটা ধর্মেই এই কাহিনী বিদ্যমান। সেই কাহিনীকে যুক্তির আলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে বইয়ের এই পরিচ্ছেদে। বিবর্তনবাদের কিছু আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য পাঠ নিয়েও সংক্ষিপ্তভাবে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য একটা অংশ তুলে ধরা যেতে পারে :

> ... প্রকৃতিতে মাঝে মাঝেই লেজ বিশিষ্ট মানব শিশু জন্ম দিতে দেখা যায়। এছাড়াও পেছনে পা বিশিষ্ট তিমি মাছ, ঘোড়ার পায়ের অতিরিক্ত আঙ্গুল কিংবা পেছনের ফিন যুক্ত ডলফিনসহ শরীরে অসঙ্গতি নিয়ে প্রাণীর জন্মের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। এমনটা কেন হয়, এর উত্তর দিতে পারে কেবল বিবর্তন তত্ত্বই।
>
> বিবর্তনের কোন এক ধাপে অঙ্গ লুপ্ত হয়ে গেলেও জনপুঞ্জের জিনে ফেনোটাইপ বৈশিষ্ট্য হিশেবে ডিএনএ সেই তথ্য রেখে দেয়। যার ফলে বিরল কিছু ক্ষেত্রে তার পুনপ্রকাশ ঘটে। [পৃষ্ঠা ৫৩]

এই অধ্যায়ে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে চোখের মতো জটিল অঙ্গের বিবর্তন হল, বিহের হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা (Irreducible complexity)[২] র খণ্ডন ইত্যাদি। প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদেই বিবর্তনের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ খণ্ডানো হয়েছে। তবুও আমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে কেন বিবর্তনবাদ বাদ দেয়া হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। কারণ ঈশ্বর প্রদত্ত আদম-হাওয়ার কাহিনীর সঙ্গে বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পুরোপুরি সংঘাতপূর্ণ। বিজ্ঞান-চেতনার

---

[1] Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam; First Edition edition (September 7, 2010)

[2] বিখ্যাত সৃষ্টিবাদের প্রবক্তা মাইকেল বিহে বর্তমান বিশ্বে বিবর্তনবিরোধী শিবিরের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী । ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত তার জনপ্রিয় বই, "Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution" এ তিনি "irreducible complexity" বা হ্রাস অযোগ্য জটিলতা নামে নতুন এক অর্থ পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্টি যন্ত্রে বেশ কয়েকটি অংশ থাকে এবং এদের মধ্য থেকে যেকোন একটি অকেজো হলে, বা না থাকলে সেটি আর কাজ করেনা। তিনি তার বইয়ে বলেন,

> যে সমস্ত জৈব তন্ত্র (Biological System) নানা ধরনের, পর্যায়ক্রমিক কিংবা সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনোভাবেই গঠিত হতে পারেনা, তাদের আমি "হ্রাস অযোগ্য জটিল" (Irreducible Complex) নামে অভিহিত করি। "হ্রাস অযোগ্য জটিলতা" আমার দেওয়া এক বর্ন্যাঢ্য শব্দমালা যার মাধ্যমে আমি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া একাধিক যন্ত্রাংশের একটি সিস্টেম বোঝাই- যার মধ্য থেকে একটি অংশ খুলে নিলেই সিস্টেমটি কাজ করবেনা।

অবিশ্বাসের দর্শন বইয়ে বিহের এই যুক্তির পূর্ণাঙ্গ খণ্ডন বিভিন্ন রেফারেন্স সহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অভাব কীভাবে গ্রাস করলে এই ধরনের বিশ্বাসকে জোর করে লালন করা যায় – ধর্মান্ধরা তা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে যাচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায় বহুল প্রচলিত 'ফ্রেডরিক হোয়েলের বোয়িং ৭৪৭ ফ্যালাসি' নামে। জাঙ্কইয়ার্ডের স্তূপ থেকে বোয়িং ৭৪৭ বিমান তৈরির সম্ভাব্যতাকে ভিত্তি করে একটি বহুল প্রচলিত কুযুক্তি উপস্থাপন করা হয় যা ধার্মিকেরা কমবেশি সবাই ব্যবহার করেন তর্কের খাতিরে। হয়েলের একটি উক্তিকে পুঁজি করে তারা বলেন, সরল অবস্থা থেকে জটিল জীবের উদ্ভব নাকি টোর্নেডোর ঝড়ে জাঙ্ক-ইয়াড্রের স্তুপ থেকে বোয়িং ৭৪৭ বিমান তৈরি হয়ে যাবার মতো অসম্ভাব্য কিছু! লেখকেরা অবিশ্বাসের দর্শন বইয়ে যুক্তিনিষ্ঠভাবে দেখিয়েছেন, এই বোয়িং ৭৪৭ উপমা বিবর্তনের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। কারণ -

১) বিবর্তন টর্নেডো বা ঘুর্ণিঝড়ের মত কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। এটা কোন দৈবাৎ প্রক্রিয়াও নয়, যে কেবল চান্স দিয়ে একে পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা করতে হবে।

২) টর্নেডো দিয়ে চূড়ান্ত কোন কিছু তৈরি করার চেষ্টা আসলে একধাপে ঘটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন কিছু বানানোর চেষ্টা। আর অন্যদিকে বিবর্তন ঘটে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বহু ধাপে পরিমিত ভিন্নতার মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (Cumulative Selection)-এর মাধ্যমে।

৩) প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জাম (যেমন জাঙ্কইয়ার্ডে রাখা বিমানের বিভিন্ন অংশ) জোড়া লেগে লেগে কিন্তু বিবর্তন ঘটে না। বিবর্তন ঘটে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হওয়ার মাধ্যমে।

৪) বোয়িং বিমানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দ্রব্য থাকে স্থির। আর বোয়িং বিমান বানানোর পেছনে থাকে নকশাকারীর একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। অপরদিকে বিবর্তন কিন্তু কোন ভবিষ্যতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মাথায় রেখে কাজ করে না, চূড়ান্ত লক্ষ্যের ব্যাপারে থাকে একেবারেই উদাসীন।

এই অধ্যায়ে চোখের বিবর্তনটাও আর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ বিশ্বাসীরা এই অঙ্গের বিবর্তনের দিকেই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন তোলেন। বহুল প্রচলিত এই যুক্তিগুলোর বিপক্ষ যুক্তি অত্যন্ত চমৎকারভাবে লিখেছেন লেখকদ্বয়।

ঈশ্বর ছাড়া কীভাবে এই মহাজগৎ তৈরি হতে পারে – এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত এবং নিশ্চিন্ত থাকি। আমাদের চিন্তা-ভাবনা হয়তো সেই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না যে কীভাবে ঈশ্বর ছাড়া কিছু তৈরি হওয়া সম্ভব, তাই তার আগেই আমরা সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ মেনে নিই। কিন্তু এই বইয়ের 'ঈশ্বর কি সৃষ্টির আদি কারণ?' এবং চতুর্থ অধ্যায়ের 'শুরুতে?' – এই দুটি লেখা পড়লে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কীভাবে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এখানে বলা হয়েছে 'যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ থাকতেই হবে' – এই ধরনের দর্শন কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশনের উদাহরণের মাধ্যমে বিজ্ঞান অনেক আগেই বাতিল করে দিয়েছে। আণবিক পরিবৃত্তি (Atomic Transition), আনবিক নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের (Radio active decay of nuclei) মতো কোয়ান্টাম ঘটনাসমূহ 'কারণবিহীন ঘটনা' হিসেবে ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব (uncertainty principle) অনুযায়ী, সামান্য সময়ের জন্য শক্তি (যা $E = mc^2$ সূত্রের মাধ্যমে শক্তি ও ভরের সমতুল্যতা প্রকাশ করে), উৎপন্ন ও বিনাশ ঘটতে পারে- স্বতঃস্ফুর্তভাবে– কোনও কারণ ছাড়াই। এগুলো সবই পরীক্ষিত সত্য। তাই আমরা যদি ধরে নিই প্রাকৃতিক বিশ্ব কোনও কারণ ছাড়া বা অন্য কারও হাত ছাড়াই এমন হয়েছে সেইক্ষেত্রে অযথা ঈশ্বরকে যোগ করার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অক্কামের রেজরের মূলনীতি অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় সকল ধারণা কেটে ফেলতে হয়। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরকে নিয়ে আসা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। লেখককেরা অভিমত দিয়েছেন, ঈশ্বরকে নিয়ে এসে কোন কিছু ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমরা কোনো প্রশ্নেরই জবাব পাইনা, উলটো আরও প্রশ্ন সৃষ্টি করি।

বইয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পদার্থের সৃষ্টি, শৃঙ্খলার সূচনা, মহাবিশ্বের সূচনা এবং প্রাকৃতিকভাবে কীভাবে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে- এ ধরণের নানা আকর্ষণীয় এবং অন্তিম রহস্যগুলো। বইয়ের এই অংশগুলো মনে

হয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দুটি অধ্যায় পড়ে মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার জন্যে তৈরি করা যাবে। তবে তার আগে ধর্মীয় হেলমেট খুলে নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ থেকে পড়াটা বাঞ্ছনীয়।

এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় – 'আত্মা নিয়ে ইতং বিতং' লেখাটি ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। প্রেতাত্মাঘটিত ব্যাপার-সাপারে ভীত হয়ে শৈশবে আমার যে কতো রাত আর দিন কেটেছে! এই অধ্যায়ে এক অংশে বলা হয়েছে:

> ... মজার ব্যাপার হল, একদিকে আত্মাকে যেমন অমর অক্ষয় বলা হচ্ছে, জোর গলায় প্রচার করা হচ্ছে আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ান যায় না, আবার সেই আত্মাকেই পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা, গরম তেলে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সবই আধ্যাত্মবাদের স্ববিরোধিতা। [*অবিশ্বাসের দর্শন*, পৃষ্ঠা ১৩৩]

আত্মা বলে যে কিছু নেই, আত্মার ধারণার একটা তুলনামূলক ইতিহাস, আত্মা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা আর সর্বশেষে আত্মা-তত্ত্বেও অসারতা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আগামী দিনের বাবা-মায়েরা আত্মা নিয়ে এই লেখাটি পড়লে নিজের সন্তানদের মিথ্যা ভয় থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন – এটা বলা যায়।

পরহেজগার মুসলিম সমাজে ১৯-এর কারিশমা দেখতে এবং প্রচার করতে খুবই পাকা। কোরানের কোন মহিমা ব্যাখ্যা করতে বললেই তারা ১৯-এর কারিশমা দেখিয়ে মুচকি মুচকি হাসেন আর শুকরিয়া আদায় করেন মনে মনে। এ নিয়ে বইও কম বের হয়নি, কিন্তু ১৯-এর মিরাকলের ভাঁওতাবাজি কোথায় ছিল, কোথায় কী গোজামিল দেয়া হয়েছে এবং কেন এটা মিরাকল হিশেবে গ্রহণযোগ্য না – তার পক্ষে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 'মিরাকল নাইন্টিন' উপশিরোনামে সন্নিবেশিত হয়েছে 'বিজ্ঞানময় কিতাব' অধ্যায়ে। ধর্মগ্রন্থ নামের তথাকথিত বিজ্ঞানের কিতাবে পৃথিবীকে স্থির এবং সমতল ঘোষণার মতো যে অবৈজ্ঞানিক কথাগুলো আছে তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই 'মিরাকেল ১৯' ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই অধ্যায়ের আলোচ্য। ইদানিং মডারেট মুসলিমদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার খুঁজে পাবার এক ধরনের ফ্যাশন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিগ ব্যাং, আপেক্ষিকতা, টাইম ডায়লেশনসহ সব নব নব জ্ঞান খুঁজে পান ধর্মগ্রন্থের আয়াতে। লেখকদ্বয় এই অধ্যায়ে দেখিয়েছেন কীভাবে গোঁজামিল দিয়ে কিংবা প্রাচীন সব আয়াতে বিজ্ঞান খুঁজে পান বক-ধার্মিকেরা, আর নিজের ধর্মগ্রন্থটিকে 'অলৌকিক' এবং 'মহাবিজ্ঞানময়' মনে করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। লেখকেরা এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন এই বলে –

> প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে 'আধুনিক বিজ্ঞানের' সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে সবক নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া তারা টিকে থাকতে পারবে না। কাজেই, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে জুড়ে দেবার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে। [পৃষ্ঠা ১৮৮]

ধর্মীয় বাণী এবং তা থেকে সৃষ্ট নৈতিকতা আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে বরাবরই খাপছাড়া এবং নির্মম। আসলে ধর্মগ্রন্থগুলো কতোটা বর্বর এবং পাশবিক তার একটা হৃদয়বিদারক উপস্থাপন হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ের 'ধর্মীয় নৈতিকতা' এবং তার পরবর্তী অর্থাৎ অষ্টম অধ্যায়ের 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামের অধ্যায়টিতে। এ অধ্যায়গুলো তাদের লক্ষ্য করে লেখা যারা ধর্মগ্রন্থগুলোতে অবিরতভাবে কেবল খুঁজে পান শান্তির বাণী এবং নিজেদের ধর্মদর্শনকে শান্তির সোল ডিস্ট্রিবিউটর হিশেবে উপস্থাপন করেন – তাদের চোখে এই লেখাটি যে জ্বলুনি সৃষ্টি করবে, তাতে সন্দেহ নেই। লেখকেরা দেখিয়েছেন মানবমনে প্রোথিত বিশ্বাসগুলো আসলে অনেকটাই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো কাজ করে। এদের আক্রমণে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার বহু উদাহরণ আছে বিজ্ঞানীদের কাছে। যেমন, *নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম* নামে এক ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট-এর উদাহরণ হাজির করা হয়েছে বইয়ে। এই প্যারাসাইটগুলো মস্তিষ্ককে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাসফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, যার ফলশ্রুতিতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্মের প্রজননে সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারা ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে। ঠিক একইভাবে জলাতংক রোগের সঙ্গেও আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পাগলা কুকুর কামড়ালে আর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে জলাতংক রোগের জীবাণু মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেলে। ফলে আক্রান্ত মস্তিষ্কের আচরণও পাগলা কুকুরের মতোই হয়ে উঠে। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে ধর্মের জিহাদি বাণীগুলো যারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও। লেখকেরা বইয়ে বলেছেন,

> নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম যেমনিভাবে ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি আমরা মনে করি ধর্মের বিভিন্ন বাণী এবং জিহাদি শিক্ষা মানব সমাজে অনেকসময়ই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মত সংক্রমণ ঘটিয়ে আত্মঘাতী করে তোলে। ফলে আক্রান্ত সন্ত্রাসী

মনন বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে টুইন টাওয়ারের উপর। নাইন ইলেভেনের বিমান হামলায় উনিশ জন ভাইরাস আক্রান্ত মনন 'ঈশ্বরের কাজ করছি' এই প্যারাসাইটিক ধারণা মাথায় নিয়ে হত্যা করেছিল প্রায় তিন হাজার জন সাধারণ মানুষকে। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর অধ্যাপক ব্রুস লিংকন, তার বই *হলি টেররস: থিংকিং এবাউট রিলিজিয়ন আফটার সেপ্টেম্বর ইলেভেন* বইয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে বলেন, 'ধর্মই, মুহাম্মদ আত্তা সহ আঠারোজনকে প্ররোচিত করেছিল এই বলে যে, সংগঠিত বিশাল হত্যাযজ্ঞ শুধুমাত্র তাদের কর্তব্য নয়, বরং স্বর্গ থেকে আগত পবিত্র দায়িত্ব'। হিন্দু মৌলবাবাদীরাও একসময় ভারতে রাম-জন্মভূমি অতিকথনের ভাইরাস বুকে লালন করে ধ্বংস করেছে শতাব্দী প্রাচীন বাবরি মসজিদ। এধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাস থেকে হাজির করা যাবে, ভাইরাস আক্রান্ত মনন কিভাবে কারণ হয়েছিল সভ্যতা ধ্বংসের। [পৃষ্ঠা ২৩২]

বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নৈতিকতার উদ্ভব নিয়ে লেখা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। জিনগত স্তরে স্বার্থপরতা কিংবা প্রতিযোগিতা কাজ করলেও, জিনের এই স্বার্থপরতা থেকেই কীভাবে পরার্থতার মতো অভিব্যক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে এ ব্যাপারটি উইলিয়াম হ্যামিলটন, রিচার্ড ডকিন্স প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের কাজের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে।

নবম অধ্যায়টি বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায়। এ অধ্যায়ে 'নিউ এথিজম' বা নতুন দিনের নাস্তিকতার প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে; আগামীর ভাইরাস মুক্ত সমাজ গঠনে নতুন দিনের নাস্তিকদের ভূমিকা কীরকম হতে পারে তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। খণ্ডন করা হয়েছে কিছু বহুল প্রচলিত মিথকে। যেমন, লেখকেরা জানিয়েছেন, 'ব্লগে লেখালিখি করতে গিয়ে ধর্মের কুফল নিয়ে আলোচনা শুরু। অনেক ধার্মিকই নাস্তিকদের উদাহরণ হিটলার, স্ট্যালিন, মাও কিংবা পল পটের মত দাম্ভিক ডিক্টেটরের কথা নিয়ে এসে প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হন। তারা হিটলার স্ট্যালিন প্রমুখের উদাহরণ নিয়ে এসে বুঝিয়ে দিতে চান যে, ধর্মের মত নাস্তিকতার কুফলও কম নয়।' *অবিশ্বাসের দর্শন* বইয়ে হিটলারের *Mein Kampf* বইটি থেকে উদাহরণ এবং উদ্ধৃতি হাজির করে দেখানো হয়েছে হিটলার কখনোই নাস্তিক ছিলেন না। হিটলার নিজেই বলেছেন তার ইহুদি নিধনের কিংবা এ ধরনের যাবতীয় কাজকর্মের পেছনে অনুপ্রেবণা ছিল স্বয়ং ঈশ্বর। হিটলারের ভাষণ এবং উদ্ধৃতির অনেক উল্লেখ আছে বইয়ে। আর অন্যদিকে স্ট্যালিন নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের বিরোধী লোকজনের উপর খুন, জখম, জেল-জুলুম করেননি, সেগুলো করেছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে। আর তার চেয়েও মজার ব্যাপার হল, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে দাপ্তরিকভাবে ধর্মকে অস্বীকার করা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্ট্যালিন রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। ইতিহাসবিদ এডভার্ড রেডজিন্সকি (Edvard Radzinsky)-র গবেষণার উল্লেখ আছে বইয়ে যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, স্ট্যালিনের সরকারের সঙ্গে চার্চের সবসময়ই ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।

বইটির শেষ দিকে সেক্যুলারিজমের শব্দার্থের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা আছে, আছে ধর্মহীন সমাজ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ফিল জুকারম্যানের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিবরণ। ফিল জুকারম্যান ২০০৫-০৬ সালে চৌদ্দমাস ধরে ডেনমার্ক ও সুইডেনে অবস্থান করে ধর্ম ও ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়ে অসংখ্য মানুষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার ২০০৮-এর বই *Society without God*-এ। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন ডেনমার্ক, সুইডেন কিংবা স্ক্যা-নেভিয়ান দেশগুলোতে যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাসের হার নিম্নগামী, সে সমস্ত দেশগুলোই বরং আজ বিভিন্ন জরিপে সুখীতম দেশগুলোর অন্যতম বলে চিহ্নিত হয়েছে। সমাজের অবস্থা মাপার বিভিন্ন পরিমাপ – গড় আয়ু, শিক্ষার হার, জীবনযাপনের অবস্থা, শিশুমৃত্যুর নিম্নহার, অর্থনৈতিক সাম্যবস্থা, জেণ্ডারগত সাম্য, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্নীতির নিম্নহার, পরিবেশ সচেতনতা, গরীব দেশকে সাহায্য – সবদিক দিয়েই ডেনমার্ক ও সুইডেন অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে উপরে। তবে লেখকেরা পাঠকদের সতর্ক করেছেন এই বলে, 'আমরা এই বলে বিভ্রান্ত করতে চাই না যে, এইসব দেশে কোন ধরণের সমস্যাই নেই। অবশ্যই তাদেরও সমস্যা আছে।' কিন্তু সেই সঙ্গে লেখকদের যৌক্তিক অভিমত,

> 'সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা যৌক্তিক পথ বেছে নেয়, উপর থেকে কারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, কিংবা হাজার বছর পুরোনো গ্রন্থ ঘেটে সময় নষ্ট করেনা' (*অবিশ্বাসের দর্শন*, পৃষ্ঠা ২৭৯)।

তথ্যগুলো আমাদের সমাজ এবং ধর্মের সম্পর্ককে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। অধ্যায়টির শেষ অংশে বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধি চর্চার ইতিহাস এবং মুক্তমনাসাইটের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস আছে, আছে তাদের ২০০৭ সালের শহীদ জননী জাহানারা ঈমাম স্মৃতি পদক অর্জন করার বিস্তৃত প্রেক্ষাপট, আছে সেই আলেখ্য–কীভাবে আজকের দিনের তরুণ ব্লগাররা নেতৃত্ব দিয়ে বিভিন্ন বাংলা ব্লগ সাইটগুলোকে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় সমৃদ্ধ করে তুলছেন। এছাড়াও পুরো বইটিতে বিবর্তনবাদের উপর প্রাথমিক কিছু চমৎকার ধারণা, নাস্তিকতা ধর্ম কী না এই নিয়ে আলোচনা, অক্কামের ক্ষুর এবং নতুন দিনের নাস্তিকতা

সহ বেশ কিছু অংশ আছে বইটিতে। শেষ করব লেখকদের বক্তব্য দিয়েই, যা আমার মতে, পুরো বইটিরই একটি ছোট্ট সারমর্ম :

> আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং মানবতা শিশুকাল অতিক্রম করে গেছে বহু আগেই। এখন আর আমরা রূপকথার কল্পিত পরম পিতা নিয়ে মোহিত নই, যে পরম পিতা 'ডাবের ভিতর পানি কেন' থেকে শুরু করে বিগ ব্যাং কিংবা ব্ল্যাকহল পর্যন্ত সবকিছুর পেছনেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে হাজির হবেন আর আমাদের প্রয়োজনের অলীক ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করবেন। সময় এগিয়েছে অনেকে, আমরা নিজেরাই এখন নিজেদের দায়িত্ব নিতে সক্ষম, মানুষ নিজেই আজ নিজের ভাগ্যবিধাতা। আমরা আর রূপকথার জাল বুনে নিজেদের প্রবোধ দিতে চাই না, বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এখন জীবন সাজাতে চাই। অন্যদিকে ধর্মগুলো এখন প্রগতির অন্তরায়, বিজ্ঞানের অন্তরায়, নারীমুক্তির পথে প্রধান বাধা। ধর্মগুলো নৈতিকতার নামে পুরোন আমলের রদ্দিমার্কা জিনিস শেখাতে চায়। মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে ভুল ধারণা দেয়, বিজ্ঞানের নানান অপব্যাখ্যা হাজির করে। আর জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ, জাতিভেদ, নিম্ন বর্ণের উপর অত্যাচার কিংবা নারীদের অন্তরীণ রাখার বৈধতা–এগুলো তো আছেই। এগুলোকে 'না' বলার মাধ্যমেই প্রগতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব, সম্ভব বিশ্বাসের ভাইরাস মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার। এটাই আজ সময়ের দাবী। [*অবিশ্বাসের দর্শন*, পৃষ্ঠা ২৯১]।

তবে একটা ব্যাপারে বলা দরকার। ফেইসবুকে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিতর্ক করতে গিয়ে এখন নতুন এক ধরণের তার্কিকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যারা কোরানে বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে আয়াত খুঁজে পায়। এই বইয়ে দুই চার লাইনে এই ব্যাপারটি লেখা আছে, কিন্তু বিস্তারিত কোন আলোচনা নেই। এই বিষয়টি নিয়ে কোন প্রবন্ধ লিখে বইটিতে সংযুক্ত করা যায়, তাহলে আরও পূর্ণতা পাবে। কোরানে বিবর্তনের তত্ত্ব এখনো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি ধার্মিক ভাইদের কাছে, তবে অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাচ্ছি এটা জনপ্রিয় হবে এবং এখন জাকির নায়েকের ছদ্মবিজ্ঞানের কপটতা নিয়ে কথা বলতে বলতে করতে করতে যেমন অস্থির হয়ে যেতে হয়, তখন সেটাও শুরু করতে হবে। তাই তার আগেই পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। পাশাপাশি বইটিতে ছোটখাট কিছু বানানপ্রমাদ আছে। আশা করব যে বইটির পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো শুধরে দেয়া হবে [এ লেখাটি যখন আমি বইয়ের জগতের জন্য লিখছি, তখন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (শুদ্ধস্বর, ফেব্রুয়ারি, ২০১২) বেরিয়ে গেছে, বানানপ্রমাদগুলোর বেশিরভাগই শুধরে নেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয় সংস্করণ পেপারব্যাকে বের হওয়ায় মূল্যের দিক থেকেও পাঠকদের জন্য হয়েছে অনেক সাশ্রয়]।

প্রতিক্রিয়াশীল আর অবৈজ্ঞানিক ধর্মগ্রন্থগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসুস্থভাবে মন জুগিয়ে এসেছে মানুষের, এখন না হয় মন আমাদের যুক্তির আলোয় জেগে উঠুক – এই কামনা।

শফিউল জয়, শিক্ষার্থী, মুক্তমনা ব্লগার